পানকৌড়ির রক্ত

– আল মাহমুদ

প্রথমে কালো পাখিটাকে আমি দেখিনি। আমার লক্ষ্য ছিল একটা শাদা বগার ওপর। বগাটা ছিল বিশাল আর ধবধবে শাদা। নিশ্চিন্ত মনে ঘাড় বাঁক করে স্বচ্ছ পানির ভেতরে সে তার ধারালো চঞ্চ উঁচু করে ঠোকর মারার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। আমিও ধীরেসুস্থে পা ফেলেই যাচ্ছিলাম। বেশ একটু দূর থেকে গুলি করলেও যে বিশৃদশ পাখিটাকে ফেলা যাবে, এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এছাড়া আমার তাড়াহুড়া না করার অন্য একটা কারণও ছিল। এ অঞ্চলে বালি হাঁস বা বটকল জাতীয় লোভনীয় বড় পাখি, যা শিকারিরা দেখামাত্রই সতর্ক হয়ে যায়, তা ছিল না। সারা মাঠ আর বিল জুড়ে কেবল কটা ধূসর কালিবগা আর ঘলবগা উড়ে বেড়াচ্ছে। আর ওড়াওড়ি করছে শালিকের ঝক। তাদের কুৎসিত চিৎকারে কানে তালা লেগে যায় পাশ দিয়ে গেলেই, উড়ে পালাতে গিয়ে মহা চেঁচামেচি জুড়ে দিচ্ছে। এই হতচ্ছাড়া শালিকগুলোকে নিয়ে কী করে যে জীবননান্দ দাশ কবিতা লিখতে পারলেন, তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। আমি বন্দুকটাকে যথাসম্ভব নিস্পৃহভাবে ডানহাতে নিয়ে আস্তে পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছিলাম। মাঠটা পার হয়ে বিলের কাছে পৌঁছতেই দেখলাম বিলও শুকিয়ে গেছে। কোথাও গর্তেটর্তে একটু আধটু পানি জমে থাকলেও সারা মাঠই হাঁটু সমান কাদাতে ভর্তি।

এখন শীতের মাঝামাঝি সময়, পৌষ মাস। বিল শুকিয়ে গিয়ে কাদা হয়েছে বনশুয়োরের চামড়ার মতো ভারি আর নরম। এর ওপর এই কদিনেই আবার একি ধরনের ঘাস জন্মেছে, দেখলে মনে হবে এরা বুঝি বাতাসের সাথে বাড়ে। কাদার ওপর লম্বা পাপড়িঅলা ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে ঘাসগুলো। রক্ষা, এইজাতীয় ঘাস ঘন। সংবদ্ধ হয় না। বেশ দূরে দূরে ছড়ানো ভাবে থাকে। ফলে দূর থেকে

বিলটাকে নতুন ঘাসে ঢাকা সবুজ চত্বরের মতো মনে হলেও, কাছে এলে অন্যরকম। তখন মনে হয়, অকূল কাদার তরঙ্গের মধ্যে কয়েকটা সবুজ পাপড়িঅলা অচেনা ফুল ফুটেছে।

আমি শাদা বগাটার এক ঝলক তাকিয়ে কাদায় নামলাম। আমার প্যান্ট আগেই গোটানো ছিল। শুধু একটু হাঁটুর ওপর টেনে তুলে কাদায় পা রাখলাম। না, একেবারে হাঁটু পর্যন্ত দেবে গেল না। আমি সতর্ক থাকাতেই সম্ভবত মাত্র গোড়ালিটা ডুবেছে। এখন থেকে আমি পা টেনে সতর্ক হয়ে হাঁটছিলাম। বগাটাকে এখন প্রয়োজনীয়। দূরত্বের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে একটা সুবিধামতো জায়গা থেকে গুলি করব। আমি সেরকম সুবিধামতো একটা জায়গা খুঁজছিলাম।

আমার সামনেই ছিল পাপড়িঅলা ঘাসের একটা বড়সড় সবুজ ফুল। এর ওপর দাঁড়িয়ে তাক করলে মন্দ হয় না। আমি আস্তে আস্তে, যাতে ঘাসের পাপড়িগুলো। দেবে না যায় এমনভাবে, পা টিপে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পায়ে জুতো ছিল না, ঘাসের চাবড়াটা একটু চেপে গেল বটে কিন্তু বেশিদূর দেবে গেল না। আমি আরও সাবধানে দুপা ফাঁক করে দাঁড়ালাম। আর একটু পা প্রসারিত করে দাঁড়াতে পারলে ভালো হত। গুলি চালাতে বেশ সুবিধে হত। বন্দুকের ধমকটা বগলের নিচ দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যেত। ঘাসের চাবড়াটা এত বড় নয় যে আর একটু সুবিধা করে দাঁড়ানো যাবে। আমি একবার চারদিকটা নজর বুলিয়ে নিলাম। আমার পেছনে প্রায় পোয়ামাইল দূরে আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম দেখা যাচ্ছে। বারবাড়ির ঘরেরসামনে আধ শুকনো খড়ের স্তুপে দুটি গাই মুখ লাগিয়ে খাচ্ছে। পাশে বিশাল আমগাছটা দাঁড়িয়ে আমি বন্দুক নিয়ে রওনা হওয়ার সময় আমার স্ত্রী আদিনা রসিকতা করে বলেছিল, আমার জন্যে ধনেশ পাখির ঠোঁট নিয়ে এস। না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকব।

থাকো দাঁড়িয়ে। শুধু ধনেশ পাখির ঠোঁট কেন তোমার জন্যে বাতারে পালক তুলে নিয়ে আসব।

আমার কথা শুনে আদিনা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে এমনভাবে হেসে উঠেছিল যে, হাসির কাঁপুনিতে তার পিঠটা নুয়ে পড়েছিল। সে হাসতেই হাসতেই আশেপাশে পেছনে চেয়ে দেখছিল, শেষে কেউ আবার আমাদের স্বামী-স্ত্রীর হাসাহাসিটা দেখে ফেলে এ ভয়ে আদিনা তটস্থ। আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ সাতদিন। সামাদের ঠাট্টামস্করা মুরুব্বিরা কেউ দেখে ফেললে ভারি শরমের ব্যাপার হবে বলে আদিনা মনে করে। অথচ আদিনাকে ঠিক গ্রামের মেয়ে বলা যায় না। বাপ-মা সহ আদিনারা কুমিল্লা শহরে বাসাবাড়ি করে আছে। আমাদের পাশের বাড়িটাই তাদের বাসা। পনের বছর ধরে তারা আছে আমাদের পাশে তার আব্বা গোমতীর বাঁধের নি নম্বর তদারকি অফিসার। পাঁচটি সন্তান নিয়ে একটি পরিশ্রমী

পরিবার। বড় দুই ভাই মোটর, বাইসাইকেল, রিক্সা ইত্যাদির খুরা পার্টসের একটি ছোটখাটো দোকান কষ্টে সৃষ্টে চালিয়ে যায়। আদিনার ছোট দুই বোন স্কুলে পড়ে। আর আদিনা কলেজে। এবারই ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। আর ভর্তি হবার পর আমাদের বিয়ে, আমার বৌ।

আমি দেখলাম ধনেশ পাখির ঠোঁটের আশায় আদিনা আমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নেই। আর মুখ ঘুরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার লক্ষ্যবিন্দুটি, আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে তাকাতে দেখে গলা বেশ লম্বা করে দেখছে। হাবভাবটা চকিত হয়ে উঠেছে। আমার আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমি আমার একনলা বন্দুকটা সোজাসুজি সামনের দিকে তাক করলাম। আশ্চর্য, পাখিটা কী ভেবে যেন তার ভয়ের ভাবটা মুছে ফেলে আবার পানির দিকে মুখ নামিয়েছে। গুলি করলাম। পাখিটা তাসের ঘরের মতো ফানির ওপর শাদা দুটি বড় পাখা খুলে বিছিয়ে দিল। একটুও নড়ছে না।

বন্দুকের আওয়াজ বেশি বড় হল না। কিম্বা হয়তো বেশ জোরেই হয়েছে, আমি ঠিক ধরতে পারিনি। স্ব শিকারিরই গুলি করার মুহূর্তে স্নায়ু উত্তেজিত থাকায় কর্ণকুহরে শব্দের ধাক্কা কোনরূপ ক্রিয়া করে না বলে জানি। আমারও বোধহয় তেমনই ঘটল। আমি বন্দুকটা ভাগ করে কার্তুজের খোলসটা ফেলে পেছনে তাকালাম। হ্যাঁ, বন্দুকের শব্দে আদিনা আমার দুই শালীকে নিয়ে আমগাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। শালীরা হাত নেড়ে কী যেন বলছে। আমিও হাত তুলে সাড়া দিলাম।

আর ঠিক তখনই কালো পাখিটাকে দেখলাম। চানধল বিলের পাশ দিয়ে যে ছোট খালটা মেঘনায় গিয়ে মিশেছে, সেই খালের কিনারায় নাওবাঁধার একটা শুকনো বাঁশের আগায় পাখিটা উড়ে এসে বসল। কালো একটা বড় সাইজের পানকৌড়ি। আমার অবস্থান থেকে বাঁশটা পঁচিশ গজও হবে না। পাখিটা বসার সময় একটা সুন্দর শব্দ করছিল আর ভেজা পাখা নাড়ছিল।

পাখিটার বসায়, পাখা নড়ায়, গায়ের কুচকুচে কালো রঙে একটা জীবিকাবিজয়ী প্রাণীর দর্প ফুটে বেরুচ্ছিল। সতর্কতামিশ্রিত একধরনের দৃষ্টিপাতে, যা কেবলমাত্র বুনো পাখ-পাখালিরাই পারে, পানকৌড়িটা আমাকে একবার দেখে নিয়ে খালের পানির দিকে তাকাল। আমি মুহূর্তে অনেক দূরে দাঁড়ানো আদিনাকে ভুলে গিয়ে পাখিটাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। দেখামাত্রই পাখিটাকে, আমার বেশ ভালো লেগেছে। বলা যায়, পাখিটার স্বতঃস্ফূর্তি ও সৌন্দর্য আমার মন কেড়ে নিল। কোথা যেন আদিনার সাথে পাখিটার একটা মিল আছে। আমি শাদা বগাটার পানিতে ভেসে থাকা শরীরটার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আদিনার সাথে পানকৌড়িটার কোথায় অমন মিল আছে আমি ধরতে পারছিলাম না। অথচ পাখিটা যই পালক ঝাড়ছে, গ্রিবা দুলিয়ে এপাশ ওপাশ দেখছে ততই মনে

হচ্ছে আমি আদিনার মধ্যে এরূপ ভাবভঙ্গি দেখেছি। অথচ আদিনার ডানা অথবা চঞ্চ থাকা একটা অসম্ভব ব্যাপার। নেইও। অবশ্য আদিনার গায়ের রঙ ময়লা। ময়লা বললে যেমন একটা মায়ামমতাময় কালোরঙকে বোঝায়, আমার স্ত্রীর একটা মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম। সেটা তাজা একটা সতেজ ভাব। আদিনা কালো হলেও যেমন তার চামড়ায় সতেজ ভাবটা সময় লেগে থাকে, পাখিটার কালো তেলতেলে পালকের মধ্যেও তেমনি ভাবটা দেখেই আমি নিতে পেরেছি। মাঝে মাঝে সকালবেলার শিশিরভেজা ঘাসেও এই প্রলঔজ্জ্বল্য আমার মন ভুলিয়ে দিলে আমি আদিনার কথা ভাবি।

আমি যখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছি তখন ফ্রকরা একটি শ্যামলা মেয়েকে দেখতাম আমার বিধবা মায়ের সাথে বেশ ভাব জমিয়ে বারান্দায় কথা বলছে। মেয়েটি পাশের বাসার আকিল সাহেবের মেয়ে। আদিনা। রোব্বার সে প্রায়ই মায়ের কুটনো কুটায় সাহায্য করতে আসত। কখনো দেখতাম আমার মায়ের আধপাকা চুল বিলি করে দিতে দিতে শুকনো আচার চুষছে।

যে বয়সে কিশোরীরা তাদের হঠাৎ গড়ে ওঠা শরীর সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, আদিনার ছিল সে বয়স। বড় জোর দশ কি এগার। বার ত্রেও হতে পারে, আমি ঠিক জানিনা। দেখতে যদিও সে হালকা পাতলাই ছিল সু তার বাহু ও বক্ষবিতান সুডৌল হয়ে উঠেছিল। সে কমলারঙের খাটো ফ্রক পরত বলে একদিন আমি তার উতও দেখে ফেলেছিলাম। সে নীলডাউনের মতো হয়ে বারান্দায় মায়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। ঠিক সেসময় মায়ের চালতার আচারে কাউয়া এসে বসলে, মা কাউয়া তাড়াতে উঠলেন। পড়ার ঘর থেকে আমি তখন নীলডাউন অবস্থায় থাকা আদিনার উরুযুগল দেখেছিলাম। কারুকার্যময় খিলানের বিশাল দুটি থামের মতো মনে হয়েছিল হাঁটুর ওপরের অংশকে। আদিনা তার খাটো ফ্রকটাই আবার শাড়ির আঁচল গোঁজার মতো করে দুপাশ থেকে জমিয়ে নাভির ওপর বেঁধে কাজ করত বলে, আমি দেখার সুযোগটা পেয়ে যাই।

আদিনা আমার পড়ার ঘরেও মাঝে মাঝে আসত। অকারণে নয়, সিগ্রেট ধরাবার আগুন চাইলে, মা রান্নাঘর থেকে দেশলাই অথবা শোলার ডগায় আগুন দিয়ে আদিনাকে কখনো-সখনো আমার ঘরে পাঠাতেন। আদিনা আগুন হস্তান্তর করে তার ফ্রকের সামনের দিকটা দিয়ে ঘামে-ভেজা মুখটা মুছতে গেলেই আমি তার নাভিও দেখেছি। তার নাভি দেখলে মনে হত তার জেগে ওঠা তলপেটের পেশিকে ভারসাম্যে আনার জন্যে এধরনের জবা ফুলের মতো গভীর নাভিমণ্ডলের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আদিনার সাথে কালো সিক্তডানা পানকৌড়িটার ভাবভঙ্গির খানিকটা মিল খুঁজে পেয়েই কিনা জানিনা, আমি আর চোখ ফেরাতে পারছি না। অথচ গুলি করতে হলে আমাকে অতি সাবধানে অন্তত খালপাড় অবধি হেঁটে যেতে হবে।

পানকৌড়িটা এখন তার ঠোঁট দিয়ে ভেজাপালক খেলাল করছে। আমি এ অবসরে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে নামলাম। সাবধান থাকা সত্ত্বেও এবার আমার পা বেশ খানিকটা কাদার ভেতরে ডেবে গেল। আমি কাদাভরা পা টেনে খালপাড়ে পৌঁছে একটু দাঁড়ালাম। এখানে দাঁড়িয়ে বন্দুকে নতুন কার্তুজ ভরে নিতে হবে। আগে আমি ঘাসের ওপর পা ঘষে চামড়ার মতো পুরো কালো আঁঠালো কাদাটা সাপ করে নিলাম। কাদা উঠে গেলে পাটা বেশ হালকা বোধ হল। আমি কার্তুজ ভরার আগে শেষবারের মতো আবার আমার শ্বশুরবাড়ির সামনের আমগাছটার দিকে তাকালাম। আদিনা এখনও গাছটার নিচে গোলাপি রঙের কালোপেড়ে শাড়িটা পরে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার ছোট দুবোন, আমার শালী মদিনা আর সখিনা মাঠে নেমে আমার দিকে সোজা দৌড়ে আসছে। সম্ভবত বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে এরা শিকারটা নিতে আসছে। আমি একবার ভাবলাম মেয়ে দুটি কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। ততক্ষণে পাখিটা যদি উড়ে যায় ভয় থাকায় আমি বন্দুকে কার্তুজ ভরে নিয়ে হাতের ইঙ্গিতে মেয়ে দুটিতে দৌড়াতে মানা করতেই তারা বিলের কাছাকাছি একজায়গায় থেমে গেল। সম্ভবত তারা বুঝতে পেরেছে আমি আরেকটা গুলি করতে যাচ্ছি।

আমি আর দেরি না করে সোজা খালের পাড়ে উঠে গেলাম। পানকৌড়িটা এখনও চক্ষু দিয়ে শরীর আর ডানা খোঁচাচ্ছে। আমি যেদিক দিয়ে উঠেছি এটা হল পাখিটার পেছনদিক। লেজের পালকগুলো ভিজে ভারি হয়ে থাকায় পাখিটা লেজ ফুলিয়ে পালকগুলোকে সাধ্যমতো ছড়িয়ে দিয়েছে। আর ছড়ানো লেজের জন্য পাখিটা আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। আমি বন্দুক তুলে তাক ঠিক করলাম। আমার ডানচোখের মণিতে বন্দুকের মাছি আর পাখিটার প্রসাধনরত কালো শরীর এক বিন্দুতে এসে মিলতেই আমি শরীরটাকে বিশেষত আমার কোমর আর হাতকে স্থির রাখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনোদিনই কি আর লক্ষ্যস্থলের দিকে পাথরে অথবা ধাতুদণ্ডের মতো অনড় ও অবিকল থাকতে পারে? পারে না। আমার হাত ধরা একমুখি বন্দুকের ভারি ব্যারেলটাও একটু এদিকওদিক হেলে যাচ্ছিল। পাখিটা কিন্তু পালক পাকসাফ করা বন্ধ করে দুটি ডানা দুইদিকে ছড়িয়ে দিয়ে গলা লম্বা করে খালের পানির মধ্যে ছোটমাছের ফুটমারা দেখছে। এখন সে অনেকটা উড়ালের ভঙ্গিতে বসে আছে। আদিনা আমাকে দুবাহু মেলে দিয়ে এভাবেই একবার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। শুধু একবার। মাত্র ছ'দিন

আগে। বাসর রাত শেষ হয়ে গেলে। আমি যখন খুব ভোরে, আমার মায়ের ফজরের নামাজের আগে পুকুরে যাওয়ার জন্য দুয়ার খুলতে খাট থেকে নামলাম, আদিনাও বিছানা ছেড়ে আমার পেছনে এসে পিঠের দিক থেকে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এসো আরও কতক্ষণ শুয়ে থাকি। আমি জানি তুমি রাগ করেছ। এই আমার প্রথম রক্ত। তুমি নোংরা হয়ে যেতে, তোমার গা ঘিনঘিন করত।

আমি তার হাত ধরে পেছন ফিরে হাত দুটি উঁচু করে ধরলে যেমন লেগেছিল, পানকৌড়ির ডানা ছড়ানো শরীরটাকে এখন আমার বন্দুকের মাছির ওপর দিয়ে তেমনি লাগছে।

আমি বন্দুকটা নামিয়ে নিলাম। না, কোনো দয়ামায়া, স্মৃতি বা কবিত্বের তাড়নায় নয়। আমি ভুল করে পাখিটার পেছন দিক থেকে লক্ষ্য স্থির করেছি। অথচ পাখি শিকারিরা কোনোদিন পেছনদিক থেকে গুলি করে না। আগে আমি কোনোদিন করেছি বলে মনে পড়ল না। কেন করে না? সম্ভবত শিকারের মুখোমুখি না হলে বারুদবর্ষণকারীরা কোনও আনন্দ পায় না। বীর্যবর্ষণকারীদেরও যেমন রমণলিপ্তা নারীর মুখমণ্ডল, বাহুমুল, স্তনযুগলের প্রত্যক্ষ অবলোকন ও পেষণের প্রয়োজন অবধারিত হয়ে ওঠে, কারণ এসব উপাচারের স্বতঃস্ফূর্তি রক্তকে মথিত করলে পুরুষের শরীর একা নিক্ষেপনীতিতে ঋজু হতে হতে এক অন্তরালবর্তী পুলকময় সত্তাকে নির্গলনে বাধ্য করে। যদিও বেগবান বারি জরায়ুকে বিদ্ধ করবে কি করবে না, এ নিয়ে বর্ষণকারীদের কোনো মাথাব্যথা থাকে না বারুদবর্ষণকারী শিকারির নীতিও তেমনি। তারাও মুখ, বুক, ডানার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব, গ্রিবার বাঁকটা একটু দেখে নিয়ে তাক ঠিক করে। এছাড়া পানকৌড়িটা সম্বন্ধে একটু বেশি সতর্কতা আমার মানসিকতাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। পাখিটা সুন্দর। পাখিটা আমার চাই। আমার ভয় ছিল, পেছনদিকে থেকে গুলি করলে প্ররা পালকে পিছনে যাবে, মাংসে পৌঁছবে না। আমি বন্দুকটা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাখিটা আবার পাখা গুটিয়েছে। এখন চক্ষু দিয়ে ডানার দুপাশে আলতোভাবে ঘষছে।

আমি পেছন ফিরে দেখলাম, মদিনা আর সখিনা আবার হাঁটা শুরু করেছে। হয়তো তারা আমাকে বন্দুক নামিয়ে ফেলতে দেখে তাক ফসকেছে ভেবে দ্রুত ছুটে আসছে। এখন হাতের ইঙ্গিতে থামতে বললে পাখিটা সচকিত হয়ে উড়ে যাবে। আর যদি এভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি তাহলেও দুই সহোদরার অসাবধান উপস্তিতিতে পাখিটাও পালাবে। আমি মুহূর্তচিন্তা করে স্থির করলাম, না গুলিই করব। আমি আরও দুপা এগিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়ালাম। এখান থেকে পাখিটা মাত্র পঁচিশ গজ দূরে শুকনো মুলিবাঁশের ওপর বসে আছে। যদিও আমি এখনও পাখিটার পেছনদিকেই আছি আমি বু দক্ষিণ পার্শ্বের খানিকটা অংশ আবছা মন দেখতে পাচ্ছি।

আবার বন্দুক তুললাম। আর কোনোরকমে ব্যারেল সই করেই ছুঁড়লাম গুলি। মুলিবাঁশের ওপর জ্বরার শব্দটা এসে আমার কানে লাগল। পাখিটা আমার চোখের সামনে উড়ে যাচ্ছে। প্রথম গুলির শব্দে হাত দুয়েক শূন্যে লাফিয়ে উঠে বিপদ কেটে গেলে অবলীলায় দুটি ডানা বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে খালের দিকে নেমে গেল। তারপর পাখা দুটি মৃদুভাবে কাঁপাতে কাঁপাতে প্রায় জল ছুঁইছুঁই অবস্থায় অনেকটা দূরত্ব পার হয়ে ঢেউয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর একবার পাখার ঝাঁপটে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিয়ে ইতস্তত দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখে নিল। আমার দিকেও মুখ যোরাল। দ্রুত। অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে আমাকে দেখে নিয়ে ঢেউয়ের দিকে গলা লম্বা করে কাঁথার। ওপর ছুঁচ গাঁথার মতো শরীরটাকে পানির ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ডুবে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে খালের উঁচুপাড়ে বন্দুক হাতে বসে পড়লাম। আমি প্রকৃতিতে, ভেজা কালো পালকলা একা পানকৌড়ির নিজস্ব জগতে, তার সচ্ছলতা, সাহস, উড়াল, গ্রিবাভঙ্গি, দর্প, আত্মরক্ষা, আহারপদ্ধতি, সর্বোপরি স্বাধীনতা ও সৌন্দর্য দেখে হিংসায় বন্দুকের গরম নলে গাল চেপে বসে রইলাম।

কল করতে করতে, হাত ধরাধরি করে মদিনা আর সখিনা খালপাড়ের ঢালু জমিতে বুজ লম্বা ঘাসের গালিচায় তাদের পায়ের কাদা সাফ করছে।আমি আঙুল দিয়ে বিলের হাঁটুসমান পানিতে উবু হয়ে ভেসে থাকা ধবগাটা দেখিয়ে দিলে তারা ছুটল সেদিকে। আমি মেয়ে দুটির আনন্দ আর ছোটাছুটি দেখে মনে মনে হাসলাম। উন্মুখ মাঠ, কোমর বাঁকানো নদী, ছোটো হ্রদের মতো বিল বা জলাশয় কিংবা সর্বগ্রাসী নিঃসীম বুজে ডুবে যাওয়ার সুযোগ এরা জীবনে কমই পেয়েছে। পৃথিবীর ম্যাপের মধ্যে এশিয়ার যোনির মতো দেখতে সুজগুল্মলতায় রো একটি বদ্বীপে, যেখানে জলোবাতাসে নিশ্বাস টানতে টানতে কিশোরীরা নানবছরেই শরীরের সমস্ত গিরো উন্মোচন করে বেড়ে ওঠে, পাটশ্বর্ণ গন্নী হরিণীর লম্বা চোখের মতো চোখে কালো মোটারেখা টেনে কাজল আঁকে, দুই রেখার মাঝে কাঁচপোকার টিপ পরে, ঝাউয়ের ঝালরের মতো পিঠের ওপর উদ্দাম চুল খুলে দিয়ে বেড়ায়, তাদের পিতামাতার কেন যে স্থায়ী আবাস, পাথরের স্ত্রবাড়ি, কংক্রিটের নগরনির্মাণের প্রতিযোগিতায় সর্বস্ব ব্যয় করে দিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তা ভেবে আমি একাকি হাসলাম।

আদিনা কি এখন আছে? আমি আমগাছটার দিকে চোখ ফেরালাম। আদিনা এখনও গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ সাতদিন। দৈহিক বা মানসিক কোনো সম্পর্কই আমার স্ত্রীর সাথে আমার এখনও গড়ে ওঠেনি। কলেজে ভর্তি হওয়ার দিন আদিনা এসেছিল আমার মাকে কদমবুসি করতে। আমি অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমি বি.এ পাশ করে স্থানীয়

মিউনিসিপ্যাল অফিসে চারশো টাকা মাইনের একটা কাজ বাগিয়েছি। লোকাল লোক বলে, এছাড়া আমার আব্বাও করে গত হয়েছেন, সেজন্য পৌর-পিতার সন্তান হিসেবে আমার প্রতি স্বাভাবিক সহানুভুতি থাকায় আমাকে চাকরিটার জন্য বেশি সাধ্য-সাধনা করতে হয়নি। আমি স্নানাহার করে অপিসে বেরুবার আগে জুতা বুরুশ করছিলাম। মা মেয়েটিকে নিয়ে আমার ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

আদিনা আজ থেকে কলেজ যাচ্ছে আনোয়ার।

আমি মার কথায় মাথা তুললাম। আদিনা হালকা আকাশিরঙের শাড়ি পরেছে। পাড়টা চওড়া, শাদা। সে নত হয়ে আমাকে কদমবুসি করল। তার পিঠের ওপর দীর্ঘবেণী বিছানো। বেণীর ফণায় দুটি শাদা গোলাপ গোঁজা। গলায় সোনার সরু হার।

আমি অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বললাম, বাহ্ আদিনা তো বেশ বড় হয়ে গেছে মা।

মা হাসলেন, মেয়েরা শাড়ি পরলেই বুঝি বড় হয়ে যায় আনু? আদিনা তো এই সেদিনও ফ্রক পরত, তোর মনে নেই?

বাহ্, মনে থাকবে না কেন! কিন্তু এখন কতবড় লাগছে, ভালো করে দেখো!

আমি হাসলাম। মা আমার কথায় থতমত খেয়ে আদিনার দিকে ফিরল। আর আদিনা আমাদের দেখাদেখিতে লজ্জা পেয়ে মুখে রুমাল গুঁজে দৌড়ে পালাল।

মা আর আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম। আদিনা চলে গেলে মা বললেন, বড় সুশ্রী মেয়ে, বড় ভালো।

আমার মার ঐ এক মুদ্রাদোষ। যা কিছু ভালো আর তার মনোমতো তাকেই তিনি সুশ্রী বলেন। 'শ্রী' বলতে তিনি বর্ণকে বোঝান না, বোঝান রূপকে সৌন্দর্যকে। আমার অত সাহস ছিল না আদিনার গায়ের রঙ যে কালো একথা মাকে বলি। অবশ্য একথা বলার কোনো যুক্তিও ছিল ন। কারণ আদিনাকে আমারও ভালো লাগত। মেয়েটি মায়ের কাছে এলে আমিও সর্বক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখতাম। এক তৃপ্তিহীন আকর্ষণ মেয়েটি তার ধ্বাঙ্গে বহন করত।

আমি মাকে বললাম, সুশ্রী না হলে তোমার কাছে পাত্তা পায় আবার।

আমার কথায় মা খুশি হয়েছেন বলে মনে হল। আমার দিকে ফিরে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, আদিনাকে তোর কেমন লাগে আনু, পছন্দ হয়?

আমি মার কথায় চমকে উঠলাম। মা কিরে পছন্দের কথা বলছে? আমি বললাম, কেমন পছন্দ মা? আদিনা তো দেখতে শুনতে খারাপ মেয়ে নয়। এছাড়া তোমার কাছে আসে তুমি ভালোবাস?

আদিনাকে বিয়ে করবি আনু?

এবার মা খুশি আর মিনতি মেশানো গলায় কথা বলছে। আমি ব্যাপারটা বুঝলাম হেসে বললাম, এতে তোমার খুব উপকার হবে মা, আমি জানি। আমার সাহায্য হবে।

আমার কথায় মা আবেগ চাপতে না পেরে তার গরম হাত দুটি দিয়ে আমার ঠাণ্ডা হাত মুঠো করে চেপে ধরলেন। আমি বললাম, ঠিক আছে। তুমি আকিল সাহেবের সাথে কথা বললো মা।

পানকৌড়িটা এরি মধ্যে কয়েকবার ভেসে উঠে, এখন আবার পাতাল নিয়েছে। পাখিটা ডুব দেওয়ার, ঢেউয়ের ওর যে ঢেউ ওঠে আমি সেই জলের লেখালেখি দেখতে লাগলাম। ততক্ষণে মদিনা আর সখিনা ডানার দুদিক থেকে পালক ধরে শাদা পাখিটাকে আমার সামনে নিয়ে এল। তাদের পা আবার কাদায় কালো হয়ে বৃষ্টির জুতোর মতো লাগছে। পাখিটা যে এত বড় তা বসা অবস্থায় বোঝা যায়নি। শাদা বগার ঝাক যখন আকাশে মালার মতো ভাসছে তখন এ ধরনের এক একটা পাখিই সামনে থেকে ঝাকটাকে বিল থেকে বিলান্তরে চালিয়ে নিয়ে যায়। দিনা আর সখিনা পাখিটার ডানা ছড়িয়ে আমার সামনে টান-টানভাব উবুড় করে শুইয়ে দিল। পাখিটার গাঢ় সুজ পা বর্ষাকালের ঝরাধানের লকলকে উঁটার মতো পেছন দিকে বিছিয়ে থাকল। পাখিটার চঞ্চুতে আর গলার একটু নিচে রক্তের লালছোপ। মদিনা বললঃ

দুলাভাই, জবাই করেননি যে, হালাল না হলে আমরা খাব কী করে?

আমি হাসলাম, শিকারে গোশত আর দরিয়ার পানি মুসলমানদের কাছে বচেয়ে হালাল। তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

তা বলে জবাই করতে হবে না?

ঘাড় কাত করে সখিনা বলল। আমি মেয়ে দুটিকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, আমি তো বিসমিল্লা বলেই গুলি করেছি। আল্লার নাম না নিয়ে মারিনি। এখন তোমরা ভেবে দেখ, খাবে কী খাবে না!

আপনি খেলে আমরাও খাব।

এইতো মুসলমানদের মতো কথা হল। মদিনার কথার জবাবে আমি হেসে বললাম।

পানকৌড়িটা আমাদের দিকে অনেকদূর এগিয়ে এসে ঢেউয়ের ওপর ভেসে উঠছে। আমি মদিনাদের আঙুল দিয়ে আমার দ্বিতীয় শিকারটা দেখিয়ে দিলে তারা চুপ মেরে আমার পেছনে এসে পিঠে হাত রেখে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। ফিস ফিস করে তারা পরস্পরকে চুপ থাকতে বলছে। তাদের ন'দশ বছরের কচি সুপারির মতো ছোট বুক আর চিবুকের চার রয়েছে আমার পিঠে। আমার গলায় তাদের

গরম নিশ্বাস পড়ছে আমার যদিও অস্বস্তি লাগছে, ও মেয়ে দুটির কিশোরীসুলভ বিস্মিত অপেক্ষা ও আনন্দকে আমি উপলব্ধি করলাম। তারা আমার কাঁধের কাছে চিবুক ঠেকিয়ে কালো পাখিটাকে দেখছে। তাদের চুলের মিষ্টি গন্ধ আমার নাকে লাগছে। অবশ্য এখন কয়েক মুহূর্ত আমার আর পানকৌড়িটার একটু একা থাকা দরকার। আমি পাখিটার চালচলন, বিচরণ, বিহার, আহারও আলোড়ন নয়ন ভরে দেখতে চাই। পাখিটা মনে হয় আমাকে বেশিক্ষণ সে সুযোগ দিতে চায় না আবার ঢেউয়ের নিচে নিঃশব্দে ডুবে গেল। আমি মদিনাদের আমরা গা ছেড়ে বসতে বলে পকেট থেকে কার্তুজ বের করলাম। মেয়ে দুটি ছোখ বড় বড় করে খুশিমনে আমার লোড করা দেখতে লাগল। আর মাঝে মাঝে আগ্রহভরে খালের ভিতর তাকিয়ে দেখতে লাগলো ঢেউয়ের ওপর পাখিটা আবার ভেসে ওঠে কিনা।

সূর্য বেশ ওপরে উঠে এসেছে। সেই শিশির ভেজা সকাল-সকাল ভাবটা আর নেই। অনেকক্ষণ রোদে থাকায় আমারও গরম লাগছে। যদিও পৌষমাস ও কপাল আর গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। আমি রুমাল বের করে ঘাম মুছলাম। অকারণ বন্দুকের নলটাও একবার রুমালে মুছে নিলাম। একটু যত্ন পেয়েই নলটা চকচক করে উঠল। আমি কার্তুজ ঠেসে দিয়ে সেফটিপিন আর লাগালাম না। পাখিটা এরমধ্যেই আবার ভেসে উঠেছে।

অই, ভেসেছে।

আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল মদিনা। আমি বললাম, দেখেছ। কথা বলো না পালাবে। কিন্তু কার কথা কে শোনে। আমার ছোটো শালী সখিনার বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম। সে তর্জনী তুলে জোরে বলে উঠল, এই যে পাখিটা দুলাভাই, মাছ খাচ্ছে।

পানকৌড়িটা গলা নাড়িয়ে সম্ভবত ছোট গুগলি-শামুক গিলছিল। সখিনার শব্দে আবার তলিয়ে গেল। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম দিলে তো ডুবিয়ে। দুবোনই লজ্জিত হয়ে নখ খুটতে লাগল। শেষে আমি হেসে বললাম, যাক এখন থেকে এখানে চুপ করে বসে থাকবে। একদম কথা বলবে না। আমি আর একটু এগিয়ে গিয়ে গুলি করব। তারা বাধ্যের মতো ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে শাদা বগাটার পাশে হাঁটু নামিয়ে বসল।

আমি উঁচুপাড় থেকে দক্ষিণপাশে নিচে জমির মধ্যে নেমে গেলাম। আমার মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি এসেছে। অবশ্য আমার মতলবটাকে দুষ্টবুদ্ধি না বলে শিকারির সহজাত চাতুরিই বলা উচিত। আমি ভাবলাম, পাখিটা এখন পানির নিচে আছে। এই অবসরে আমি পাড়ের আড়াল ধরে সোজাসুজি পাখিটা

যেখানে ডুবেছে, সেখানে তীরের উঁচু জায়গায় উঠে বন্দুক বাগিয়ে বসে থাকব। আর পাখিটা ভাসামাত্রই গুলি করব।

আমি আমার মতলব মতো পাখিটা যেখানে ডুব-সাঁতার করছিল ঠিক সেখানে ঢালু বেয়ে উঠে এলাম। আর একটা হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে পেশাদার শিকারিদের কায়দায় অন্য হাঁটুর ওপর বন্দুক রেখে পানকৌড়িটা আবার যেদিক ভেসে উঠতে পারে আন্দাজে সে দিকটায় তাক ঠিক করলাম। নিশানা সোজা করা মাত্রই, আমাকে আর অপেক্ষা করতে হল না, কিছু ঘোলাটে বুদসহ পাখিটা লাফিয়ে ওঠা কালবাউসের মতো পানির ওপর ভেসে উঠল। আমি মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ট্রিগার টানলাম। এবার আমার দক্ষতার মধ্যে উত্তেজনা কম থাকায়, বন্দুকের আওয়াজটা তীব্রভাবে আমার কানে বাজল। বন্দুকের ধাক্কাটা মোটা লাঠির আকস্মিক গুতোর মতো আমার কণ্ঠাস্থি ও বাহুসন্ধির ওপর এসে পড়ায় আমি মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে, পড়লাম। ব্যারেলের হালকা ধোঁয়া নেমে গেল পানির সীমা পর্যন্ত।

প্রথমে গুলি-খাওয়া ভোঁদড়ের মতো একটা বৃত্তাকার ঢেউ তুলে পাখিটা পানির ওপর চক্র মারল। তারপর গলাটা ঢেউয়ের ওপর লম্বাভাবে সমান করে ডানা দিয়ে পানিতে ক্রমাগত বাড়ি মারতে মারতে ঘুরতে লাগল। আর মনে হল, পাখিটা যেখানে গুলি খেয়ে তড়পাচ্চে সেখানে কেউ একবালতি টাটকা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। খালের মধ্যভাগে বেশখানিকটা পানি রক্তে এমন রঙিন হয়ে গেল যে আমি ভেবে পেলাম না, একটা পানকৌড়ির শরীরে এত রক্ত কিভাবে থাকতে পারে। পাখিটা লালরক্ত, সবুজ জল ও তার গাঢ় কালো পালকের আড়ালে যন্ত্রণাদায়ক এক বর্ণের সমারোহ সৃষ্টি করে আমাকে স্তম্ভিত করে দিল। আমার হঠাৎ বোধ হল, আমার মাথাটা ভয়ানক ব্যথা করছে। আমি বন্দুকটা মাটিকে রেখে, এ দৃশ্য থেকে আমার জ্বালা-ধরা চোখ দুটিকে রেহাই দেবার জন্য দুহাতের পাতায় চোখ ঢেকে বসে রইলাম। আমার আরও হাত থাকলে আমি কানেও আঙুল দিতাম। আমার অতিরিক্ত কোনো হাত বা আঙুল না থাকায় আমি অসহায়ের মতো প্রাণপূর্ণ একটা বিপুল কালোপাখির দীর্ণ মণিরগের রক্ত-মোক্ষণের নিঃশব্দ গর্জন কর্ণপটাহে ধারণ করে আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট হয়ে গেলাম।

আমি এভাবে চোখ ঢেকে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। মদিনা ও সখিনার হুড়াহুড়ি, চিৎকার আর উচ্ছ্বসিত সহাস্যে আমি চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তাকালাম। মদিনা পাখিটা তুলে আনবার জন্য খালের পানিতে সাঁতার কাটছে। আর সখিনা পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে তাড়া দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি যা বুবু, পাখিটা ডুবে যাবে যে!

সখিনার ভয়, এ অবস্থায় পানকৌড়িটা ডুবে গেলে আর পাওয়া যাবে না। আমি বন্দুকটা তুলে সখিনার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মদিনা ততক্ষণে পাখিটার একটা ডানা ধরে ফেলেছে। পানকৌড়িটা যদিও তখন নড়ছিল তবুও বোঝা যাচ্ছে এখন পাখার ঝাঁপটানিটা কম। পাখিটা নেতিয়ে পড়েছে। পাখিটাকে প্রায় বুকে চেপে ধরে মদিনা পাড়ে এসে উঠল। মদিনার পরনে ছিল আদিনার শাড়ির রঙের মতো হালকা-গোলাপী রঙেরই একটা ফ্রক যা ভিজে গিয়ে গায়ে চামড়ার সাথে সেঁটে গেছে। সে যখন। কালোপাখিটাকে তার বুকের ওপর থেকে নামাল আমি দেখলাম তার কচি ফলের মতো কালো নরম বুকে রক্তের লাল ছোপ গাঢ় হয়ে লেগেছে। মনে হচ্ছে লাল শাপলার আধফোঁটা দুটি কলি পৌষের শিশিরে ভিজে থিরথির করে কাঁপছে। মদিনাও পানি থেকে উঠে শীতে হি-হি করছিল। আমি বললাম, ফ্রকটা খুলে নিংড়ে নাও, ঠাণ্ডা লাগবে। আদিনা প্রথম একটু লজ্জিত চোখে আমাকে দেখল, পরে আমার দিকে পেছন দিয়ে ফ্রক খুলে নিংড়াতে লাগল।

পাখিটা ডানা ছড়িয়ে আমাদের পায়ের কাছে পড়ে আছে। তার চঞ্চু ও বুকে সিঁদুরের মতো একটু-একটু রক্ত এখনও জমাট বাঁধেনি। যদিও পাখিটা নেতিয়ে ঠাণ্ডা মেরে আছে, ও চোখ দুটি ভোলা থাকায় মনে হচ্ছে, খুনি উড়াল দিয়ে পালাবে। আমি পাখিটাকে একদৃষ্টিতে, পলক না ফেলে দেখছিলাম। আমার মাথাধরাটা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, চোখ জ্বালা করছে। একভাবে একদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছি না। আমি বন্দুকটা ধরে আস্তে আস্তে পানকৌড়িটার পাশে বসে পড়লাম। তারপর বন্দুকটা ঘাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে আবার হাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম। আর সাথে সাথেই সেই দৃশ্যটা, পানকৌড়িকে গুলি করার সেই মুহূর্তটি আমার কল্পনার মধ্যে আবর্তিত হতে থাকল। আমি দেখলাম, বুজ জলের পটভূমিকায় আপন রক্তে রঞ্জিত ঢেউয়ের ওপর একটা অত্যন্ত প্রাণবন্ত কালোপাখি মৃত্যু যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে।

আমি যখন আবার চোখ মেললাম, দেখলাম, সখিনা শাদা বগটাকেও পানকৌড়ির পাশে শুইয়ে দিয়েছে। পরস্পর বিরোধী প্রতিকূল বর্ণের কারণেই হোক অথবা অন্য কোনো দৃশ্যের মহিমাতেই হোক, আমার চোখ দুটি আমার সামনে বহমান শাদাকালো পালকের আপাত সহনশীলতায় কিছু স্বস্তি এবং মুক্তি পেল বলা যায়। আমি আমার ছোট শালীকে বললাম, আজ আর শিকার হবে না, চলো আমরা ঘরে ফিরি।

ফেরার সময় সখিনা শাদা, আর মদিনা কানোপাখিটাকে বহন করে চলল। ওরা আগে আর আমি পেছনে। আমি বুঝতে পারছি আমার মাথার রগ রেশ ফুলে উঠেছে। আমার চোখ কোনো দৃশ্যকে সহ্য

করতে পারছে না। মাঝে মাঝে আমার এমন হয়। আমি অসহ্য মাথাব্যথায় ছটফট করি। রোগটা আমি আমার মার কাছ থেকে পেয়েছি। আমার মাকেও দেখি মাঝেমাঝে অসহ্য মাথাব্যথায় কাঁদেন। কোনো টেবলেট টুবলেটে তার পেইন কমে না। কখনো দেখেছি, ব্যথায় যন্ত্রণায় কাত্ম হয়ে তিনি একধরনের পুজ পাতা, সম্ভবত ঘৃঙ্কাঞ্চল বেটে তালুতে তার প্রলেপ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। আমারও এইমুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ার বাসনা জাগছে। এ গ্রামে নিশ্চয়ই দৃঙ্কাঞ্চন পাওয়া যাবে। ঘরে ফিরেই আদিনাকে তুলে আনতে বলব।

আদিনার কথা মনে পড়তেই আমি গাছটার দিকে তাকালাম, না এখন ও দাঁড়িয়ে নেই। ধনেশের ঠোঁট দুরে থাক, কেউ রূপকথার হীরামনের জন্যেও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে না।

আদিনার সাথে আমার বিয়ের ব্যাপারটা মোটামুটি সহজভাবেই শেষ হয়েছে। বলা যায়। দাবিদাওয়া কোনো প্রতিবন্ধকতা আনেনি। আমার শ্বশুরের শুধু একটি মাত্র শর্ত ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, বিয়েটা হবে গ্রামের বাড়িতে তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে। বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঝামেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা গ্রামেই থাকবেন। আমি আমার বন্ধু বান্ধবসহ এসে আস্ত শেষ করে যথারীতি বৌ নিয়ে কুমিল্লায় ফিরে যাব। তারপর ফিরাযাত্রায় আদিনাকে নিয়ে আদা। এখানে ক'দিন থেকে শেষে শ্বশুর শাশুড়িসহ আবার কুমিল্লায় যাত্রা করবো। আমি আর আদিনা মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় সেই 'ফিরাযাত্রায়' এসেছি।

মাঝেমাঝে আমার যে এমন অসহ্য মাথাব্যথা হয় আদিনা জানত আমরা বিল থেকে বাড়িতে পা দেবামাত্রই আদিনা, আমার ফোলা লালচোখের দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো, চোখ এত লাল কেন? আমি বললাম, ভয়ানক মাথা ধরেছে। শোব।

আগে মাথাটা ধুইয়ে দেব?

না, আমি দাঁড়াতে পারছি না। বলে আমি বন্দুকটা আদিনার হাতে দিয়ে সোজা শোবার ঘরে ঢুকে কাদাভরা পা নিয়েই বিছনায় লুটিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো পাখি দুটোকে নিয়ে মদিনা ও সখিনার চিল্লাচিল্লি শুনতে পাচ্ছি। সম্ভবত তারা উঠোনে লোক জড়ো করে ফেলেছে। কারণ, আমি শুনলাম, কে যেন পানকৌড়িটার বিশালত্ব এবং পাখিটার রানে যে প্রচুর মাংস হবে, এ নিয়ে তারিফ করছে। পরক্ষণেই আদিনা এসে আমাকে দুটো মাথাধরার বড়ি খাইয়ে, পাথরের মতো নিরেট হয়ে যাওয়া আমার মাথাটা বালিশে তুলে দিলে আমি বালিশ আঁকড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলাম। আমি আর আদিনাকে ঘৃতকাঞ্চনের প্রলেপ দেওয়ার কথা বলতে পারলাম না। কারণ আমি জানতাম, এ ধরনের ওষুধের কথায় আদিনা হাসবে। আদিনা আমার পায়ের কাদা একটা ভজা তেনা দিয়ে বেশ

ভালো করে পরিষ্কার করে দিতে দিতে বলল, গাঁয়ে একজন এল. এম. এফ ডাক্তার আছে, তাকে ডাকতে লোক পাঠাব?

আমি বললাম, না। প্রায় চব্বিশঘণ্টা এ ব্যথা থাকবে, ওষুধে কাজ হবে না।

আমার কথা শেষ হবার আগেই আমার শ্বশুর শাশুড়ি ঘরে এসে ঢুকলেন। শ্বশুর বললেন, ডাক্তার ডাকতে আপত্তি করছো কেন? ডাক্তার এসে একটা ব্যবস্থা করে দিন। তুমি ভোরে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেলে, মনে হচ্ছে ঠাণ্ডায় মাথা ধরেছে। শহরের মানুষ খালিপায়ে ভেজা দুব্বা মাড়াতে আছে? তার ওপর তুমি এসেছ কাদাপানি ভেঙে।

তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। শাশুড়ি আমার মাথায় জলপটি দিয়ে ব্যথা সারে কিনা তা দেখার জন্য আদিনাকে পরামর্শ দিলেন। আমি বললাম, এ ধরনের মাথাব্যথা আমার মাঝে মাঝে হয়। ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার ডাকতে হবে না। একটু ঘুমোতে পারলে ব্যথা সেরে যাবে।

আমি যাতে ঘুমাতে পারি আদিনাকে সে চেষ্টা করতে বলে, শ্বশুর-শাশুড়ি ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারা চলে গেলে আদিনা দরজায় খিল এঁটে দিল। তারপর একটা রুমাল ভিজিয়ে আমার কপালের ওপর জলপটি চেপে ধরে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আজ হবে। ব্যাপারটা বন্ধ হয়েছে।

আমি আদিনাকে বিছানায় উঠে এসে আমার পাশে শুয়ে মাথা টিপে দিতে বললাম। আদিনা হাসল, তুমি এখুনি চাও?

আদিনা বিছানায় উঠে এলে আমি তাকে বুকের কাছে টেনে আনলাম, আমার ব্যথার কোন উপশম নেই। আদিনা তার বুক দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ঢেকে দিলে আমি পানকৌড়ির পালকের মতো গাঢ় কালোরঙের মধ্যে আমার জোড়া ভ্রমরের মতো জ্বালাধরা চোখ দুটিকে ডুবিয়ে দিয়ে স্বস্তি পেতে চাইলাম। আস্তে আস্তে কালো পালকের মতো অন্ধকার ফিকে হতে লাগল। লিকার-ভরা চায়ের কাপে ফোঁটা ফোঁটা দুধ মেশালে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। কিম্বা পাঙাশ মাছের পেটের মতো একধরনের ভোর-ভোর অবস্থা এসে আমার চোখের অন্ধকারকে হালকা করে দিল। কেন জানি মনে হল খালবিলে যেসব পাশপাখালি ওড়ে সেসব পাখির গায়ের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছে। আর ঠাণ্ডা আরাম-মেশানো বাতাস আমার গা ছুঁয়ে বইছে।

আমি আবার আমার একনলা বন্দুক হাতে ত্রিকোণাকৃতি চরভূমির নরম গুল্মলতায় পা মাড়িয়ে চলতে লাগলাম। নদীটা যেখানে বাঁক নিয়েছে আমি সেখানে এসে পেশাদার শিকারির মতো হাঁটু গেড়ে বন্দুক

বাগিয়ে বসলাম। আমার বসার সাথে সাথে কালো বেলুনের মতো একটা পানকৌড়ি পানির ওপর ভেসে উঠল। আমি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে গুলি ছুড়লাম। গুলির শব্দ আর বন্দুকের পাল্টা ধকলে আমার চোখের সামনে সমগ্র নিসর্গচিত্রটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আমি দেখলাম, একটি শ্যামবর্ণ নারীশরীর নদীর নীলিমায় আপন রক্তের মধ্যে তোলপাড় করছে। মনে হল, আলোকিত এই মুখ, বাহু, বুক ও যুগল-উরু আমার চেনা। আমি আদিনার নাম ধরে নদীর দিকে ডাক দিতে গেলে দেখলাম সেই অঙ্গশোভাকে ঢেউয়ের ছলছলানি তুলে ডুবে যাচ্ছে। আমি বন্দুকের গরম নলে গাল চেপে অসহায়ের মতো বসে রইলাম। বারুদের গন্ধে আমার চারপাশটা ভরে যেতে লাগল।